হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৪ অক্টোবর, ২০০৮ কলকাতা ✳ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

"ঈশ্বর কে কত নামজপ করল দেখেন না। খুব নাম করত সুবল শ্রীদামেরা। কৃষ্ণ সেখানে যেতেনই না। আর না ডাকতেই চলে যেতেন ভীমার্জুনের কাছে। তারা কীর্তন করত না, নাম করত না, কাজ করত। ভগবানও কাজের লোক চান, ফালতু লোক নয়।"

—শিবপ্রসাদ রায়।

আমাদের কথা

পূজো কাটল বেশ ভালোভাবেই। বাঙালির সারা বছরের প্রার্থনা - মা, পূজোয় যেন বৃষ্টি না হয়, বন্যা না হয়। আনন্দ উৎসব আর ঠাকুরদেখা যেন মাটি না হয়। হয়নি। মনের আনন্দে ঠাকুর দেখা হয়েছে। কলকাতার রাস্তাঘাট আর পূজা প্যান্ডেলগুলো ভেসে গিয়েছে আলো আর জনতার স্রোতে। এই সময় আশেপাশে তাকানোর অবকাশ কই? পশ্চিমবঙ্গের পাশেই আসাম জ্বলছে। সেখানে এক লক্ষ হিন্দু ঘরছাড়া হয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে দরং, উদালগুড়ি ও কোকরাঝাড়ে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়েছে সরকারি হিসাবেই ৫৪ জন। বেসরকারি হিসাবে ১০০-র বেশি। এই খবর কি বাংলার মানুষ জানে? জানে না। কারণ খবরের কাগজ শুধু প্যান্ডেলের ছবি, ভিড়ের হিসাব আর বড় হেড লাইনে বিজয়ার মিষ্টির খবর। সাজ পোশাক আর স্টাইল তো আছেই। টিভিতেও তাই। তাহলে বাঙালি জানবে কি করে? অবশ্য বাঙালি জানতে চায়ও না।

মনে পড়ে ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের কথা। ১লা অক্টোবর বাংলাদেশ নির্বাচন হল। শেখ হাসিনাকে পরাজিত করে বেগম খালেদা জিয়ার বি এন পি দল ক্ষমতায় এল। নির্বাচনের দিন থেকেই সাত দিনের মধ্যে গোটা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হল তা শুনলে হাড় হিম হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিবেশি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের হল না। কারণ এখানে বাঙালি তখন পূজোয় মত্ত। সে চিন্তা করল না যে ওপারের বাঙালিরা যদি দুর্গাপূজা না করে ঈদ-উৎসব যাপন করত তাহলে, তাদের উপর এই ভয়ংকর অত্যাচার হত না। তাই, আমরাও দুর্গাপূজা করি, ওরাও করে, ওদের এই দুঃখের দিনে একটু পাশে দাঁড়াই, ওদের বেদনার একটু সমব্যথী হই। না, তাতে আমরা রাজী নই। পূজোর আনন্দ নষ্ট করা চলবে না।

এখন আসামের হিন্দুদের দুঃখের দিনেও একই চিত্র। কিন্তু এর পরিণতি কী? বাঙালি হিন্দুর এই সংকীর্ণ স্বার্থপর মানসিকতা, এই আত্মঘাতী আচরণ তাকে আর একবার উদ্বাস্তু করবে। তাকে আবার রিফিউজী হতে হবে। সারা ভারতব্যাপী ইসলামী আগ্রাসনের প্রথম বলি হবে আসাম। তারপরই পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যের অন্ততঃ ১১টি জেলার বহু এলাকার মানুষরা আবার পাকিস্তানের ছায়া দেখতে পাচ্ছে, আবার দেশভাগের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। ধানতলা, বানতলা ঘটছে। সাইলেন্ট মাইগ্রেশন চলছে। তবুও বাঙালির সামগ্রিক চেতনায় কোনও নাড়া লাগছে না। আমাদের কর্মীদের প্রচেষ্টা হবে সেই চেতনায় নাড়া দেওয়া আর তার জন্য অনেক রক্ত ও ঘাম ঝরাতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আসামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলছে

গত ৩ রা অক্টোবর থেকে আসামের দরং এবং উদালগুড়ি জেলায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে । দাঙ্গাগ্রস্থ অঞ্চল গুলি বোড়ো উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। এই সব এলাকায় এর পূর্বেও দাঙ্গার ইতিহাস আছে। কিন্তু এইবারই প্রথম নিজেদের এলাকায় উপজাতি বোড়োরো মার খাচ্ছে।

৩ অক্টোবর উদালগুড়ি জেলার মোহনপুর গ্রামে একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বোড়ো এবং মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা শুরু হয় তাতে ইতিমধ্যে এক লক্ষেরও বেশি মানুষকে গ্রাম ছাড়া হয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। সরকারী হিসেবেই ৫৪ জন নিহত হয়েছে । স্থানীয় লোকেরা জানিয়েছেন জঙ্গলে আরও অনেক মৃতদেহ পড়ে আছে। হিংসা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসন মোতায়েন সৈন্যের সংখ্যা ১০ কোম্পানি থেকে বাড়িয়ে ১৫ কোম্পানী করেছে। সেনাপাড়া মুদিবাড়ী, ভকতপাড়া এবং উদাল গুড়ির কলেজে তৈরি হওয়া এই শরণার্থী শিবির গুলিতে আশ্রয় গ্রহণকারীরা বোড়ো, গারো, অসমীয়া ও বাঙ্গালী হিন্দু। আদিবাসী গ্রাম পুনিয়া সম্পূর্ণ খালি হয়েগেছে। কলিতাপাড়া গ্রামবাসীরা প্রতি মুহূর্তে হামলার আশঙ্কায় ত্রস্ত। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন যেভাবে এলাকায় মুসলীম জনসংখ্যা বেড়েছে তাতে এই ঘটনার আশঙ্কা তারা আগে থেকেই করছিলেন। পশ্চিম কলিতাপাড়ার বাসিন্দা অমল ডেকা জানান, তাদের গ্রামে ১৯৮৩ সালে মাত্র ৬ টি মুসলীম পরিবার ছিলো, এখন আছে ১০০০ টি পরিবার। নিজেদের বোড়ো ট্রাইবাল ডেভলপমেন্ট কাউন্সিল এলাকায় বোড়োরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। ব্যাপক সংখ্যায় বংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশ কারীদের আগমনের ফলেই এই পরিবর্তন। গ্রামে গ্রামে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানো হচ্ছে। দরং জেলায় ২০০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টেই মুসলীমের সংখ্যা ৩৫.৫৪ শতাংশ হয়ে গিয়েছিলো। আর ঐ জেলায় মোট শিশুদের (০-৬বছর) মধ্যে মুসলীমদের সংখ্যা হয়ে গিয়েছিলো ৪৭.৩৯ শতাংশ। তার উপর ক্রমাগত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ চলছে। সুতরাং সম্ভবতঃ এখন দরং জেলায় মুসলমান ৪০ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। এর পরিণাম আজ দেখা যাচ্ছে। মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা উদালগুড়ির পাঁচটি গ্রামে পাকিস্তানী পতাকা ওড়ায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে আসামে ইতি মধ্যেই ২৩ টির মধ্যে ৭ টি জেলা মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে ঃ ধুবড়ী, বরপেটা, গোয়ালপাড়া, নগাঁও, মরিগাঁও, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ। এই প্রক্রিয়া আরও দ্রুত গতিতে চলছে। এর জন্য টাকা আসছে সৌদি আরব থেকে আর পরিকল্পনা করছে আই.এস.আই। গ্রেটার বাংলাদেশের আওয়াজ উঠেছে। আই.এস .আই এবং বাংলাদেশের ডি.জি.এফ. আই আগামী ৬ বছরের মধ্যে আসামকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার টার্গেট নিয়েছে। সেই টার্গেটকে রূপান্তরিত করার পথে একটি পদক্ষেপ এই দরং ও উদালগুড়ির বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

সকল পাঠককে "সংহতি সংবাদ"-এর পক্ষ থেকে জানাই শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা

এ কোন বাংলা ?

কোথায় আছি আমরা ? একি সেই বাংলা যেখানে মা দুর্গাকে আবাহন করে দশমীর দিন মায়ের পায়ে আলতা আর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে মায়েরা সিঁদুর খেলে। শেষবারের মত মায়ের পায়ে আঁচল ঠেকিয়ে ছেলের মাথায় দিয়ে বলে 'মাগো আসছে বছর আবার এসো'। না, এবছর একথা বলতে পারেনি পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থানার গোপালনগর শিবতলার মায়েরা। শিবতলা পূজা কমিটির দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিতে যাওয়ার পথে বাঁধা দিতে এগিয়ে এল শেখ লালা ও সাহ্ আলমের নেতৃত্বে পাশের পাড়ার মুসলমানেরা। অজুহাত, মসজিদ আছে তাই ওই রাস্তা দিয়ে মা দুর্গার যাওয়া চলবে না। এরপর যা ঘটলো তা কেবল ওপার বাংলাতেই হওয়া সম্ভব। বেশকিছু উন্মত্ত মুসলীম হিন্দুস্থানের মাটি এই বাংলাতেই মা দুর্গার হাত, মাথার মুকুটসহ মাথা ভেঙ্গে দিলো- যেমন করে ওরা ভেঙ্গেছিলো ওপার বাংলার বিখ্যাত রমনা কালীবাড়ির মাতৃবিগ্রহ। বিস্ময়ে হতবাক বিমূঢ় হিন্দুরা বুকে একরাশ জ্বালা নিয়ে তাদের খন্ডিত দেবীপ্রতিমাকে বিসর্জন দিতে না পেরে বাধ্য হয়ে বসিয়ে রাখে কোলাঘাট জশাড় এর রাস্তায়।

এতদিন জানা ছিলো, হিন্দু রক্ত ঠিক মাছের রক্তের মতো। কাটলেও ঠান্ডা, কোন কিছুতেই গরম হয়না। কিন্তু পরদিন সকালে রাস্তায় দেবী দুর্গার ভেঙ্গে দেওয়া প্রতিমা দেখে হিন্দুর রক্ত তার চরিত্র হারালো। কাতারে কাতারে জড়ো হওয়া হিন্দু প্রতিবাদে এগিয়ে গেল দুষ্কৃতিদের পাড়ায়। ক্রিয়া থেকেই হয় প্রতিক্রিয়া। তাই মুসলীম দুষ্কৃতিকারীরা যারা এতদিন দুষ্কর্মের পরে পেয়েছে হিন্দু রাজনৈতিক নেতার গোপন আশ্রয়, বা দেখেছে থানায় ধরে নিয়ে গেলে পুলিশকে ফোন করে ছাড়িয়ে আনার ব্যাবস্থা, তারাই সেদিন দেখলো দুষ্কর্ম দেখে পালিয়ে যাওয়া নয়, ঘুরে দাঁড়ানো কাতারে কাতারে হিন্দুর সঙঘবদ্ধ প্রতিবাদ। এবার টনক নড়ল

শেষাংশ পৃষ্ঠা - ৪

কার্ত্তিক মহারাজকে হুজি ও সিমির হুমকি

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ (কার্ত্তিক মহারাজ)কে হুজি ও সিমির পক্ষ থেকে চিঠিতে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। বেলডাঙ্গা থেকেই পোস্ট করা এই চিঠিতে হুজি ও সিমির বেলডাঙ্গা থানা কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে রোজার মাসে কাফেরদের দুর্গাপূজার ঢাক ঢোল ও মাইকের আওয়াজে তাদের শরীর মন না-পাক্ হয়ে যায়। আল্লার কাছে তাদের নামাজ অদা করতে খুব অসুবিধা হয়। তাই আগামী বছর থেকে বেলডাঙ্গায় দুর্গাপূজা বন্ধ করতে হবে। আর এই আদেশ অমান্য করলে প্যান্ডেলে লাশ পড়বে। এই চিঠিতে পূজ্যপাদ কার্ত্তিক মহারাজকে তুই তোকারি করে আরও বলা হয়েছে যে তিনি আশ্রমের গুটিকয় আবাসিককে নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলাকে বাঁচাতে পারবেন না, এবং তাঁর আশ্রমকেও মাদ্রাসাতে পরিণত করা হবে।

এই চিঠি মুর্শিদাবাদ জেলার এস পি কে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন এই ঘটনা গুরুত্ব সহকারে নিয়ে বেলডাঙ্গা আশ্রম এবং মহারাজের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও বাড়িয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের গতিবিধির উপরও নিয়ন্ত্রণ জারী করা হয়েছে।

বাংলাদেশে লোকনাথ আশ্রমে হামলা

বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদীর শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রমে গত ১৫ দিনে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা চারবার হামলা চালায়। আশ্রম কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় গত ৪ অক্টোবর চাঁদপুর জেলার নতুনবাজার থেকে আসা লোকনাথ ভক্তদের একটি বাসে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা হামলা চালালে ১৫ জন গুরুতর আহত হন। গত ৬ ই অক্টোবর মহাসপ্তমীর দিন নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা লোকনাথ ভক্তদের একটি মাইক্রোবাস চুরি হয়ে যায়। এছাড়া গত ২ ও ৩ অক্টোবর কয়েকজন ভক্তকে সন্ত্রাসীরা মারধর করে। আশ্রম কমিটির সভাপতি সঞ্জিত কুমার বলেন, এই পর পর হামলায় ভক্তরা আতঙ্কে আছে। এই খবর প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের "প্রথম আলো" সংবাদপত্রে ৯ ই অক্টোবর ২০০৮ তারিখে।

বাম শাসিত ত্রিপুরা কি ইসলামী সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর ?

ঈদের আগের দিনে ১লা অক্টোবর সাধারণ মানুষের রক্তে লাল হল আগরতলার মাটি। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় বিধানসভা ও তার অদূরবর্তী বাজারগুলিতে ৪টি ধারাবাহিক বিস্ফোরণে সাঙ্ঘাতিকভাবে জখম হলেন ১০০ জন। বেসরকারী সূত্রে ৩ জন মৃত ও অন্ততঃ ৬ জন মরণাপন্ন হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেলেও, সরকারী সূত্রে নিজেদের গাফিলতি ঢাকতে মৃতের খবর অস্বীকার করা হয়েছে। সন্দেহ সেই ইসলামী জঙ্গী হুজির দিকে। এর আগে 'প্রগতিশীল' 'ধর্মনিরপেক্ষ' মুখ্যমন্ত্রী কমরেড মানিক সরকারের এক বিশিষ্ট মন্ত্রী শাহিদ চৌধুরীর সঙ্গে হুজির ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পেরে চৌধুরীকে মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় দেওয়া হয়। কিন্তু তলে তলে হুজি ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কার্যকলাপ প্রকাশ পেল খোদ আগরতলাতেই।

পরবর্তী পর্যায়ে আগরতলা পুলিশ সন্দেহভাজন ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ) জঙ্গীদের এই বিস্ফোরণের সঙ্গে যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছে। তবে বলা বাহুল্য ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক জঙ্গী গোষ্ঠীর সঙ্গে খ্রীষ্টান ও মুসলমান মৌলবাদী শক্তির ঘনিষ্ঠতাও প্রকাশ পেয়ে গেছে।

ইসলামী মৌলবাদের ভারতীয় জনক আব্দুল নাসের মাদানী কেরালার কমরেডদের নয়নমণি। বাংলায় কমরেডদের প্রশ্রয়ে লালিত পালিত ইণ্ডিয়া মুজাহিদিন-এর মাথা কলকাতার ছেলে আমির রেজা। সে ২২ জানুয়ারী ২০০২ সালে কলকাতায় মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে জঙ্গীহানার মূল অভিযুক্ত। দঃ ২৪ পরগণার জালালুদ্দিন ওরফে বাবুভাই বারাণসীর সঙ্কটমোচন মন্দির বিস্ফোরণের সঙ্গে অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেও যুক্ত। সবই 'শান্তির মরুদ্যান সৃষ্টিতে' ও 'বাংলার কমরেডদের সৌজন্যে'।

এখন সকলেই দেখেছে ত্রিপুরার বামপন্থী সরকারের মন্ত্রী শাহিদ চৌধুরীর হুজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও আগরতলার বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর রূপ। আসলে তিন বাম শাসিত রাজ্য কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা হয়ে উঠেছে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের ভয়ঙ্কর আঁতুড়ঘর।

জেহাদী জঙ্গী দমনের চাবিকাঠি

দিল্লী বিস্ফোরণের পান্ডাদের উত্তরপ্রদেশের আজমগড় থেকে ধরে আনতেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে এল। পুরো এলাকায় মুসলীম বসতি। তারা প্রশ্ন তুলেছে দিনের বেলায় জনবহুল এলাকায় পুলিশ ধরপাকড় করতে আসবে কেন ? কিন্তু তাদের এলাকায় আশ্রয় নিয়ে এইসব জঙ্গীরা পরপর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত শত নিরীহ মানুষকে কেন মারছে - এ প্রশ্নে তারা নীরব। আমাদের এই বাংলাতেও কতশত মুসলীম জেহাদীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল হল মুসলিমপ্রধান এলাকা - নিয়মিত খবরে তা প্রকাশ। পুলিশ ও গোয়েন্দার লাখ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জেহাদী দমনে তাদের সাফল্য আসবে না । প্রকৃত সাফল্য তখনই আসবে যখন মুসলীম সমাজের নেতৃবৃন্দ ও মুসলীম জনতা তসলিমা বিতাড়নের জন্য রাস্তায় না নেমে নিজেদের এলাকা থেকে জেহাদী বিতাড়ণের জন্য রাস্তায় নামবে। তাই জেহাদী দমনের চাবিকাঠি মুসলীমদেরই হাতে। ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম হয় , তাহলে সেই চাবিকাঠি ব্যবহার করতে তো মুসলীমদের আপত্তি থাকার কথা নয়। তাই মুসলীম মাত্রই জেহাদী জঙ্গীর সমর্থক না বিরোধী - সেকথা প্রমাণের চাবিকাঠিও তাদেরই হাতে।

চাঁদুয়া এলাকায় সিমির উড়ো চিঠি, স্কুলে স্কুলে সাম্প্রদায়িক তৎপরতা

পরিকল্পনা মাফিক বিদ্যালয়গুলিতে এক সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা টিফিনে নিষিদ্ধ মাংস খাসীর মাংস বলে হিন্দু বন্ধুদের খাইয়ে দিয়ে ধর্ম নষ্ট করে আনন্দ পাচ্ছে বলে অভিযোগ। একইভাবে হিন্দু পরিচয় দিয়ে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে হিন্দু মেয়েদের প্রলোভিত করে তাদের নষ্ট করে পরে বিবাহে বাধ্য করা বা চা খেয়ে ভাঁড় ফেলার মতো করুণ পরিস্থিতির সম্মুখে পড়ার চিত্র উঠে এল চাঁদুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক আলোচনাসভায়। নানাভাবে বিব্রত ও হিন্দু জনসাধারণের ডাকে হিন্দু সংহতির কার্যকর্তা প্রকাশ দাস, উপানন্দ ব্রহ্মচারী ও সুন্দর গোপাল দাসের উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় নোদাখালী থানার চাঁদুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪ই সেপ্টেম্বর। ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় মল্লিক (পিতা— ইউসুফ মল্লিক)কে লেখা জনৈক কে. খানের এক হাত চিঠিতে এলাকার হিন্দু মেয়েদের ছলেবলে বিয়ে করা, হিন্দুবিরোধী ছাত্র সংগঠন করা ও ঈদের আগে হিন্দুদের আক্রমণ করার মত নানা অভিযোগ উঠেছে। এর আগে উক্ত বিজয় (হিন্দু ভেবে ভুল করবেন না!) এলাকার জনৈকা তনুশ্রী আদককে ফুসলিয়ে বিয়ে করে বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে স্থানীয় আই সি ও জেলা (দঃ ২৪ পরগণা) পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ করা হয় ১/১০/০৮ তারিখে। দঃ ২৪ পরগণায় ইসলামী ছাত্র সংগঠনগুলির রমরমা ও জেহাদী রিক্রুটমেন্টের গোপন কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদে প্রকাশ গড়িয়া সোনারপুর এলাকার একটি বিদ্যালয়ে অজানা অচেনা তিনটি ছেলে ছাত্রবেশে বেশ কয়েকদিন ধরে ক্লাসে যোগ দিয়ে স্কুলের ছেলেদের কাছে গুপ্ত ট্রেনিং-এর কাগজপত্র বিলি করে উধাও হয়। কাছা খোলা হিন্দু অভিভাবকদের একটু খেয়াল করা উচিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির খোলা জানালা দিয়ে বিদ্যালয়ে পাঠরত তাদের ছেলেমেয়েগুলো যেন ইসলামী সুখ ভোগের আজাদী ও জেহাদী হাওয়ায় ভেসে না যায়।

সল্টলেকে মন্দির বন্ধের অপচেষ্টা

কলকাতার সল্ট লেকে ইসি /৭১ নম্বরে সুনন্দ ভিলার বাড়ীর কালী মন্দিরে সেদিন থেকেই সেক্যুলার কালো ছায়া নেমে আসে যেদিন থেকে ঐ বাড়ীর পাশের প্লটে চীনা দূতাবাস স্থাপিত হয়। চীনা দূতাবাসের সুরক্ষা ব্যাহত হচ্ছে এই অজুহাতে সল্টলেক পৌরসভার তরফ থেকে ঐ বাড়ীর মালিককে মন্দির সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়। পৌরসভার এই কাজ সম্পূর্ণ বেআইনী। কোন বাড়ীর মন্দির সরিয়ে নিতে বলার এক্তিয়ারই পৌরসভার নেই। পৌরসভার এই অবৈধ নোটিসের বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতির কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর ৫০-৬০ জন কর্মী ঐ চীনা দূতাবাস ও বিধাননগর পৌর সভার সামনে জোরালো বিক্ষোভ দেখায়। সেখানে বক্তব্যে বলা হয় যে কলকাতা বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া সত্ত্বেও রানওয়ের পাশ থেকে সরকার মসজিদ অপসারণ করতে পারে না। তাই বাজে অজুহাতে হিন্দু মন্দির সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হিন্দু সংহতি বরদাস্ত করবে না । হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, ভারত ও চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যবিরোধী বর্তমান চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ও শাসকদের ভারত সীমান্তে হাজার হাজার বর্গ কিমি ভারতের জমি জবরদখল ও ভারতবিরোধী চক্রান্ত অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

আহা পাকিস্তানের কি সম্মান !

ইউনাইটেড নেশন সংস্থা পাকিস্তানে কর্মরত তার কর্মীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তাদের পরিবারের শিশুদের পাকিস্তান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কারণ সেখানে শিশুদের নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি নেই। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের ম্যারিয়ট হোটেলে গত ২০ শে সেপ্টেম্বর জেহাদী আত্মঘাতী হানায় ৫৫ জন নিহত হওয়ার পর ইউনাইটেড নেশনস এই নির্দেশ দিয়েছে। ইংল্যান্ড ও অন্য কয়েকটি ইউরোপীয়ান দেশ তাদের পাকিস্তান দূতাবাস থেকে শিশু ও নাবালকদের সরিয়ে দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের দৃষ্টিতে পাকিস্তান আর শিশুদের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য একটা দেশ নয়। তবুও আমাদের কাশ্মীরে ওই লোকগুলো পাকিস্তানের পতাকা ওড়ায় আর পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে ওই লোকগুলোকে ওদের প্রিয় দেশ পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

[সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৩-১০-০৮]

নাশকতার লাইসেন্স

নিরাপত্তার কারণে 'র'এরমতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার শীর্ষপদে বসানো হয়নি কোন মুসলমানকে। এমনকি আই. বি. -র মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় মুসলীম সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ভিভি.আই.পি দের নিরাপত্তার জন্য গঠিত স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপে মুসলীমদের প্রবেশ প্রায় বকলমে নিষিদ্ধ । বিষয়টি উদ্বেগের বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক আবু সালেই শরিফ। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দফতরে বিশেষ করে যাদের মূল কাজই হল দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিকে নজর রাখা সেখানে মুসলীম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রাখার কথা চিন্তা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি তথ্য তুলে ধরি।

উত্তর দিনাজপুরের ইসলাম পুরের পঞ্চায়েত অফিস। প্রধান তমিজউদ্দিন। এই তমিজউদ্দিনের পঞ্চায়েত অফিসের আলমারি থেকে পাওয়া গেল তিনটি রিভালবার ও ১৭ টি বুলেট। পঞ্চায়েত প্রধানের পদে বসে যদি এই অবস্থা হয় তবে 'র' বা আই. বি. -র মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার শীর্ষপদে বসলে কি নাশকতার লাইসেন্স দেওয়া হবে না ?

অনুপ্রবেশকারী নয়

এদের সংখ্যা ১২ লাখ । এরা বাংলাদেশ থেকে গোপনে বর্ডার পার হয়ে আসেনি। এরা দস্তুর মত পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছে । তারপর হারিয়ে গেছে। এদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। বি.এস. এফের ডি.জি এ.কে.মিত্র এই তথ্য জানিয়েছেন। এরা ভিসা নিয়ে বৈধভাবে ভারতে ঢুকেছে। কিন্তু তারপরে আর ফিরে যায়নি। অবৈধভাবে এদেশে থেকে গেছে। এই বাংলাদেশীদের খুঁজে পাওয়া যায় না কেন ? কারণ লোকে বলে যে ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে গেছে। এই লোকচলতি প্রবাদটা থেকে একটা কথা বোঝা যায় যে বাংলাদেশ আর ভারতের মুসলমানরা একই ঝাঁকের কই।

[সূত্র ঃ দি পাইওনিয়র ঃ ২-৯-০৮]

আরও ৬২৫ কোটি

আমাদের দেশে মাদ্রাসার শিক্ষকদের সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান বেতন দেওয়া হবে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ৬২৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করেছে। এই সম্পূর্ণ টাকাটাই কেন্দ্র সরকার দেবে। রাজ্য সরকারের কোন দায়িত্ব নেই। মাদ্রাসা সংগঠনের কর্তা ব্যাক্তিরা জানিয়ে দিয়েছে যে তারা সরকারের টাকা নেবে কিন্তু ইসলামী শিক্ষাকে লঘু করার চেষ্টাকে বরদাস্ত করবে না।

[সূত্র ঃ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস , ২-৯-২০০৮]

ঁ বিজয়া মানে কি ?

তপন কুমার ঘোষ

গ্রামের বাঙ্গালি হিন্দু মনে করে বিজয়া মানে মা দুগ্গার বিসর্জন। শহরের বাঙ্গালি মনে করে বিজয়া মানে সামাজিক প্রথা - পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়। ছোটরা মনে করে বিজয়া মানে বড়দেরকে প্রণাম করে নারকেল নাড়ু বা মিষ্টি খাওয়া। সব মিলিয়ে বিজয়া মানে একটা উৎসব, আনন্দ, হৈ হৈ। আর এই সব হবে মা দুগ্গাকে জলে ভাসানোর পর। আচ্ছা, মা দুর্গাকে তো বাঙালি ঘরের মেয়ে মনে করে। বৎসরান্তে তার বাপের বাড়িতে আসা। আমরা তার বাপের বাড়ির লোকজন। তাই তার আসা উপলক্ষে আমাদের এত আনন্দ। সেই মেয়ে চারদিনের ছুটির শেষে আবার যখন তার পতিগৃহে ফিরে যাচ্ছে, আবার এক বছর তার দেখা পাবনা, চোখের জলে আমরা তাকে বিদায় দিচ্ছি, ঠিক তারপরেই এত আনন্দ -উৎসব, এত মিষ্টি খাওয়া হিসাবে মেলে কি? ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে না? আর এর নাম বিজয়া-ই বা কেন? কোনো ডিক্সনারিতে কি পাওয়া যাবে বিসর্জন বা বিদায় শব্দের সঙ্গে বিজয় শব্দটির কোন সম্বন্ধ আছে? তাহলে মা দুর্গাকে যখন চোখের জলে বিদায় দিচ্ছি ঠিক তার পরেই বিজয় শব্দটাই বা এল কি করে, আর আনন্দ উৎসবই বা কেন?

আহা, বাঙালি যদি এর কারণটা জানত, তাহলে আজ বাংলার চেহারাটাই অন্য রকম হত। শুধু এ বাংলাটাই নয়, ও বাংলাটাও। বাংলার বাইরে অনেকে প্রশ্ন করে, দুর্গাপূজা বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব। এই উৎসবে বাঙালি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ভেসে যায়। তাহলে বাংলায় নাস্তিক কম্যুউনিষ্টদের এত প্রভাব কেন? দুর্গা-কালী ভক্ত এই বাংলায় অধার্মিক কম্যুনিষ্টরা কি করে ৩০ বছর ধরে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে? বিজয়ার প্রশ্ন, আর এই কম্যুনিষ্ট প্রশ্ন - দুটো প্রশ্নেরই উত্তর এই যে বাঙ্গালি পূজো করে আর বিজয়া করে, দুটোই না বুঝে। তাই দুর্গাপূজাকে বছরের বৃহত্তম উৎসব হিসাবে নিয়েও সম্পূর্ণ পূজা বিরোধী কম্যুনিষ্ট পার্টির ঝান্ডা ধরতে ভোট দিতে বাঙ্গালির কোনো অসুবিধা হয়না। এটা কি বাঙালির আত্মপ্রবঞ্চনা, দুমুখো সুবিধাবাদী নীতি? অনেকটা, সবটা নয়। অজ্ঞতাও বটে। সুবিধাবাদী নীতি ও অজ্ঞতার যোগফল। অজ্ঞতাটা কি? ধর্ম সম্বন্ধে না জানা। বিজয়া সম্বন্ধে না জানা। না জেনে পালন করা। জানলে হয়ত করত না । কী করত না? হয় ধর্ম করত না, অথবা কম্যুনিজম করত না। কারণ ধর্ম করে মার্কসবাদ করা যায় না এবং মার্কসবাদ করে ধর্ম করা যায় না। এই অজ্ঞানতা যদি আরও দীর্ঘদিন চলে, তাহলে কোনদিন হয়ত দেখব মা দুর্গার পিছনের চালিতে মাথার উপর যেখানে শিবের ছবি থাকে, সেখানে মার্কসের ছবি ঢুকে গেছে। তখন কে বেশি অসন্তুষ্ট হবে মার্কস না মা দুর্গা - বলা কঠিন ।

এখন আসা যাক বিজয়ার প্রশ্নটাতে। বিদায়, বিসর্জন, গঙ্গার ধারে আঁখি ছলোছলো, তার সঙ্গে মিষ্টি খাওয়া, শুভেচ্ছার কোলাকুলি, পোস্টকার্ড, গ্রিটিংস কার্ড, SMS- এর মিল কোথায়? এর উত্তরটা ভালোভাবে দেওয়া যাক। বহুদিক থেকেই এই উত্তরটা গুরুত্বপূর্ণ ।

এই উত্তরটা ভালোভাবে জানতে গেলে এর সঙ্গে জড়িত আর একটা প্রথার ব্যাপারে জানতে হবে। তা হল বিজয়া দশমীর দিন বিসর্জনের আগে সধবা মহিলাদের সিঁদুর খেলা। এই সিঁদুর খেলার সঙ্গে বিজয়ার প্রণাম, কোলাকুলি, মিষ্টি খাওয়া অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ।

আসা যাক উত্তরে। মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে মহিষরূপী মহিষাসুর বধ করলেন মা দুর্গা। সেখান থেকে দৈত্য রূপ নিয়ে বেরিয়ে এল ঐ অসুর। নবমী তিথিতে তাকে বধ করলেন মা দুর্গা। বিজয় লাভ সম্পূর্ণ হল। তাই দশমীতে পালন হল বিজয় উৎসব, নাম যার বিজয়া বা বিজয়া দশমী। এই ঘটনা ঘটেছিলো সত্য যুগে। কোন এক বসন্ত কালে। এল ত্রেতা যুগ। অধার্মিক অত্যাচারীপরনারীহরণকারী রাবণকে ধ্বংস করার জন্য রামচন্দ্র দেবী দুর্গার পূজার আয়োজন করলেন। সে সময় বসন্ত কাল ছিল না। কিন্তু রামের হাতে সময় নেই। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তাই শরৎ কালে অকালেই দেবীর পূজা করলেন। যুদ্ধে রাবণ বধ হল। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে দেবী দুর্গার আরাধনা করলে যুদ্ধে জয় লাভ হয়। তাই বিজয়াদশমী শুধু বিজয় লাভের জন্য উৎসবই নয়, ওই দিনটা বিজয় লাভের জন্য, যুদ্ধ শুরু করার জন্য একটা শুভ দিন পবিত্র দিন হিসাবেও গণ্য হতে লাগল। সুতরাং ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছে ওই দিনটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠলো। বিজিগীষু রাজারা তাদের রাজ্যের সীমা বাড়ানোর জন্য ওই দিন যুদ্ধ যাত্রা শুরু করলেন। শুরু হয়ে গেল নতুন পরম্পরা। ওই দিনটা পালিত হতে লাগল 'সীমোল্লঙ্ঘন দিবস' হিসাবে। নিজের সীমা অতিক্রম করে অভিযান করা। উদ্দেশ্য রাজ্য বাড়ানো।

এখন রাজা যখন যুদ্ধে যাবেন, একা তো যাবেন না। তাঁর সঙ্গে সৈন্য দল যাবে। এই সৈন্য তো প্রজাদের মধ্য থেকেই আসে। তারাও যুদ্ধে যাবে। আর সবাই জানে যুদ্ধে গেলে বাঁচা-মরার নিশ্চয়তা নেই। যুদ্ধে সে আহত বা নিহতও হতে পারে। এক বিপদ সংকুল অনিশ্চিত যাত্রা। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা হবে কিনা? তার নিজের এবং আত্মীয় পরিজনের, বন্ধুবান্ধবের। স্ত্রী-পুত্র কন্যার। তাই সে যুদ্ধে যাবার আগে সকলের কাছে বিদায় নিতে যায়। বড়দের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে যায়।

বড়রা গুরুজনরা আশীর্বাদ করেন এবং মিষ্টি খাওয়ান। ছোটরাও তাকে প্রণাম করে ও আশীর্বাদ নেয় । আর সে তার বন্ধু বান্ধব সমবয়স্কদের আলিঙ্গন কোলাকুলি করে বিদায় গ্রহণ করে। তারাও তাকে বিদায় শুভেচ্ছা জানায়। আর ঐ যে সৈন্যটি, তার স্ত্রী তো হবে সব থেকে বেশি উৎকণ্ঠিতা। কে জানে তার স্বামী ফিরবে কিনা? যদি না ফেরে তাহলে সে হবে বিধবা। এরকম অনেক স্ত্রী । তাই তারা যায় মা দুর্গার কাছে, ওই দিনই। সিঁদুর ঢালে মা দুর্গার পায়ে। তারপর সেই সিঁদুর পরিয়ে দেয় পরস্পরের সিঁথিতে। আশা-- মা দুর্গার চরণছোঁয়া সিঁদুর, এ তো পবিত্র, এর তো অনেক শক্তি । এই সিঁদুর আমার সিঁথিতে পরালে কারো শক্তি নেই এই সিঁদুর মোছে। এ সিঁদুর হবে অক্ষয় । সুতারং আমার স্বামী যুদ্ধে নিরাপদ থাকবে। সেই আশায় সিঁদুর পরানো। তাই এই সিঁদুর খেলা। একটু পরেই স্বামী বেরোবে সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে । সুতরাং এই সিঁদুর খেলা এবং বিজয়ার প্রণাম কোলাকুলি মিষ্টি খাওয়া- এ কোনোটাই আনন্দের উৎসব নয়। মা দুর্গাকে বিসর্জন দিয়ে আনন্দ করা যায় না। এসব হচ্ছে যুদ্ধ যাত্রার ঠিক পূর্বের কার্যকলাপ, নিরাপত্তা কামনায় এবং বিজয় কামনায়। অর্থাৎ সিঁদুর খেলা ও বিজয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আমাদের পূর্বপুরুষদের যুদ্ধ যাত্রার ইতিহাস। আজ বাঙ্গালি ওই কার্যকলাপ গুলোকে অনুষ্ঠানরূপে ধরে রেখেছে । ভুলে গিয়েছে এর ইতিহাস ও তাৎপর্যকে এবং হয়ে গিয়েছে এক যুদ্ধ বিমুখ জাত। আর পুরুষানুক্রমে এই যুদ্ধ বিমুখতা বাঙ্গালিকে পরিণত করেছে এক ভীরু কাপুরুষ পলায়নপর জাতে, যে জাত লড়তে জানেনা, পালাতে জানে। তাই বাংলা ভাগ হয়, বাঙ্গালি রিফিউজি হয়।

এখন বিজয়াদশমী হয়ে গেছে 'শুভদিন'। কিসের? গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি কাজের জন্য। বাঙ্গালী যদি বিজয়ার কোলাকুলির আসল ইতিহাসটা জানতো, তাহলে হয়ত এমন যুদ্ধ ভীরু জাতে পরিণত হত না। কিংবা হয়ত আসল ইতিহাসটা জানলে 'ওরে বাবা দরকার নেই' বলে প্রথাটাই বাদ দিয়ে দিত।

এখন এই ইতিহাসের অন্য একটা দিকে তাকানো যাক। এই বাংলায় তো ক্ষত্রিয় ছিলো না। ইতিহাসে যতদুর চোখ যায় , দেখা যায় এই বাংলায় জাত ছিল , বর্ণ বা বর্ণপ্রথা ছিল না। খুব সম্ভব বর্ণাশ্রমও ছিল না। সেইজন্যই নাকি পান্ডবরা সারা ভারত চষে বেড়ালেও বাংলায় ঢোকেনি। তাই এই বাংলাকে বলা হত পান্ডববর্জিত রাজ্য। তাহলে ক্ষত্রিয় না থাকলেও ওই প্রথা ও পরম্পরা গুলি তো এই বাংলাতেই আমরা প্রবল ভাবে দেখতে পাই। অর্থাৎ উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয়দের মত বাঙালি যুদ্ধে যেত। এর থেকে দুটো সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসছে । এক, বাঙালি বা এই বাংলার অধিবাসীরা যুদ্ধ করত। দুই , বাংলা ও বাকী ভারতের ইতিহাস ও পরম্পরা একই। অতি প্রগতিশীল বামপন্থী ইতিহাসকার ও বুদ্ধিজীবিরা বাংলা ও বাঙালির উৎসবকে বাকী ভারতের থেকে আলাদা করে দেখাতে চান। তা ভুল। দেখা যাচ্ছে যে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, প্রথা ও পরম্পরা বাকী ভারতের মতই ধর্ম নির্ভর, পুরাণ ও রামায়ণ যার উৎস। সুতারং বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রাচীন ভারতীয় জনগোষ্ঠীর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কোনভাবে পৃথক নয়।

এই ভাবে ভারতের যে কোন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ঠিকভাবে দেখলে একই জিনিস আমরা দেখতে পাবো যে বিশাল ভারতের সকল জনগোষ্ঠী একই সূত্রে আবদ্ধ । এটাই আমাদের জাতীয় সংহতি। আর এর ভিত্তি ধর্ম, আমাদের হিন্দু ধর্ম। এই সত্যকে যারা অস্বীকার করতে চায় , তাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত অথবা তারা কোন বিদেশী শক্তির এজেন্টের কাজ করছে। তারা এই ঐক্যকেভাঙ্গতে চায়, সুতরাং তারাই বিচ্ছিন্নতাবাদী। কাশ্মীরে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের থেকে এরা কোনো অংশে কম ক্ষতিকর নয়। এরা জাতীয় ঐক্য ভাঙ্গতে চায়, এরা দেশ ভাঙ্গতে চায়। এদের থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। এদের জন্যই ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান হয়েছে, এদের জন্যই কাশ্মীর, নাগা, মিজো ও খালিস্থানী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রশ্রয় পেয়েছে। এরা জাতীয় সংহতি ভঙ্গকারী, এরা দেশদ্রোহী।

মাদানি গান্ধী

আব্দুল নাসের মাদানি। একদা মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নেতা ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ একে গান্ধীজীর সাথে তুলনা করেছিলেন। ভারতের দক্ষিণ বিশেষ করে কোয়েম্বাটুরের লোকেরা এ নামে শিউরে ওঠেন। কারণ বস্ত্র শিল্পের বড় শহর কোয়েম্বাটুরে পর পর বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রাণ নিলেন ৫৯ জনের আর আহত করলেন ২৫০জনকে। এই গান্ধীজীর বর্তমান ঠিকানা কোয়েম্বাটুর জেলে। তবে অন্য বন্দীর মত নয়। দীর্ঘদিন ধরে জেলের হাসপাতালে তিনি আছেন জামাই আদরে। কারণ তার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত কেরল ও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীরা হাজার হাজার টাকা খরচ করে বিশেষ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছেন। এ পর্যন্ত না হয় ঠিক ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর জন্য প্রাণ কাঁদা কংগ্রেসীরা কেরল ভোটের আগে প্রচার করলেন ক্ষমতায় এলে মাদানিকে জেল থেকে ছাড়ার জন্য তারা চেষ্টা করবে। যেমন করে আফজল গুরুর ফাঁসি তারা আটকে রেখেছে। আর সিপিএম সাংসদ টি. কে. হামসা গোপনে জেলে মাদানির সাথে দেখা করে সি.পি.এম. প্রার্থীদের হয়ে মুসলিম ভোট ভিক্ষা করে আসেন। সন্ত্রাসবাদী গান্ধীজীর হয়ে যারা উমেদারি করছেন তাদের সবিনয়ে বলি আসল গান্ধীজীর বাম ও ডান পাশে বসতেন তাঁর একান্ত ভক্ত মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি। কিন্তু যেই পাকিস্তানের দাবী এল অমনি ওরা গান্ধীজীকে শুধু ত্যাগই করেনি, তারা বলেছিল, একজন খুনি মুসলমানের চেয়ে গান্ধীজী নিকৃষ্ট। ইতিহাসের এ শিক্ষা আমরা নেব না -- কারণ জঙ্গীরা যে আমাদের কাছে মাদানি গান্ধী।

এদের আর কবে চিনবেন?

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার নতিবপুর গ্রামের নতিবপুর উচ্চবিদ্যালয়। এখানে হিন্দু ছাত্র সংখ্যাই সর্বাধিক, মুসলিম ছাত্র সংখ্যা নগন্য। তবুও গত ২ মাস যাবৎ এখানে নামাজের জন্য প্রতি শুক্রবার একঘন্টার টিফিনের সময়ের বরাদ্দ করা হল। ফলে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু ছাত্ররা শিবের জন্মদিন সোমবারে শিবস্তোত্রম করতে এক ঘন্টা টিফিনের সময় অনুমতি চাইল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। ভারতমাতার ছবিসহ কিছু প্রচার পত্র তারা টাঙ্গিয়ে দেয় বিদ্যালয়ের প্রাচীরে। বাইরে থেকে এক মুসলমান যুবক সেই প্রচারপত্রগুলো শুধু ছিঁড়েই ফেলেনি, সেকুলার রাষ্ট্রের মুসলমান অধিকার বলে ভারতমাতার ছবিকে পদদলিত করল সকলের চোখের সামনে। স্বাভিমানী কিছু হিন্দু যুবক প্রতিবাদে এগিয়ে যেতেই মুসলিম ছেলেটি বলে 'জানিস, উলুবেড়িয়াকে ৯২ সালের মেটিয়াবুরুজ করে দিতে পারি।'এ আমরা কোথায় বাস করছি, হিন্দুস্থানে না পাকিস্তানে ? কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। মীরজাফর ও জয়চাঁদ এর বংশধর ভোটের কাঙ্গাল কিছু হিন্দু রাজনৈতিক নেতা যারা অতীতে মুম্বাই থেকে পুলিশ প্রহরায় আনা বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের উলুবেড়িয়া স্টেশনে ট্রেনের কামরা ভেঙ্গে মুক্ত করে দিয়েছিলো, তারাই আজ আবার ভারতমায়ের পদদলনকারী ঐ মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে সরব হয়েছে। এদের আর কবে চিনবেন?

প্রধানমন্ত্রীর ঘুম

একজন মুসলিম ডাক্তারকে জেহাদী সন্দেহে আটক করা হয় অস্ট্রেলিয়ায়। এই খবরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নাকি রাত্রে ঘুমোতে পারেন নি। সাম্প্রতিক দিল্লী বিস্ফোরণে যে এতগুলি নিরপরাধ প্রাণ চলে গেল তার জন্যই কি তিনি ঘুমাতে আমেরিকা চলে গেলেন? কিন্তু ভারতে এসে বিস্ফোরণের পান্ডাদের ধরপাকড়ের খবর শুনে আবার তাকে ঘুমোবার জন্য বড়ি খেতে হবে না তো? সংবাদে প্রকাশ, এই খবরে অনেক রাজনৈতিক নেতা রাতে ঘুমের বড়ি খাওয়া শুরু করেছেন।

বাগনানে হিন্দু যুব সম্মেলন

গত ২৮ সেপ্টেম্বর রবিবার হাওড়া জেলার বাগনানে সরস্বতী ব্যায়ামাগারে হিন্দু সংহতির এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাগনানের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কৃষ্ণভক্ত বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী পরিমল চন্দ্র ঘোষ। জেহাদী মুসলীম সন্ত্রাসবাদীদের বোমা বিস্ফোরণে হাজার হাজার নিরপরাধ ভারতবাসীর জীবনহানি, অসমে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন প্রভৃতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সুরক্ষা এবং বিশেষ করে বাংলা থেকে পালিয়ে আবার রিফিউজী হওয়ার পরিণতি রুখে দিতে যুবসমাজের ভূমিকার কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন হিন্দু সংহতির পশ্চিমবঙ্গ সংযোজক শ্রী তপন কুমার ঘোষ । সভায় বয়স্ক মানুষ জনের সাথে ১৮ থেকে ২৫ বছরের যুবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সভাপতি শ্রী পরিমল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপস্থিত যুবকদের সামনে প্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন ও সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। উৎসাহ ও প্রেরণায় ভরপুর এই যুবকেরা বাংলাকে রক্ষা করতে নতুন উদ্যমে কাজ করার শপথ নেওয়ার পর এক আনন্দঘন পরিবেশে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

ঈদের গেট নিয়ে নোদাখালিতে ক্ষোভ

'পিপলস্ ইউনিটি ঈদ্ উদ্‌যাপন কমিটি' গত চার বছর ধরে 'চণ্ডীপুর-দাশপাড়া ও তৎসংলগ্ন গ্রামবাসীবৃন্দের' একুশ বছরের পুরানো দুর্গাপূজা মণ্ডপের সামনে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে বিশেষ গেট তৈরী করে লাগাতার দুর্গাপূজা বন্ধের চেষ্টা চালাচ্ছে। ঈদ্ উদ্‌যাপনের পর পরই দুর্গাপূজা পড়ায় স্থানীয় মতলববাজরা আর ঈদের গেট খুলতেই চায় না। তাতে যতই ঢাকা পড়ে যাক না দুর্গাপূজার মণ্ডপসজ্জা। স্থানীয় অধিবাসীদের যাতায়াত বন্ধ করেই ওই ঈদ গেট তৈরী তাদের রীতি।

বাধ্য হয়ে দুর্গাপূজা উদ্যোক্তারা গত বছরের মত এবছরও পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পূজা কমিটির কর্তাব্যক্তিগণ হিন্দু সংহতির সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। এজন্য দুটি বৈঠকও হয়। স্থানীয় হিন্দু যুবকগণ যে কোন মূল্যে দুর্গাপূজার পরিবেশ নষ্ট করার ইসলামী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শপথ নেয়। ৭ই সেপ্টেম্বর হিন্দু সংহতির পক্ষে শ্রী তপন ঘোষ ও উমেদ সিং বৈদ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে ওই এলাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ৫২টি পূজা কমিটির প্রতিনিধিরা তাঁদের কাছে এলাকার মতলববাজ ধর্মান্ধ ও রাজনৈতিক মদতপুষ্ট গোষ্ঠীর দ্বারা হিন্দু সমাজের উপর নানা নিগ্রহের কথা তুলে ধরেন।

গত ১২-০৯-০৮ তারিখে জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দুর্গাপূজা ও ঈদ কমিটি, এম. এল. এ, এম. পি. প্রতিনিধিদের যৌথ মিটিংএ সিদ্ধান্ত হয় ২ অক্টোবর ইদ্ সম্পন্ন হওয়ার পর দুর্গাপূজার দর্শনার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ওই গেট খুলে নেওয়া হবে। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই ঈদের গেটের কাপড় খুলে নতুন কাপড় লাগিয়ে সেখানে 'ঈদ্ ও শারদীয়ার শুভেচ্ছা' লিখে দেয়। স্থানীয় হিন্দু জনগণ এ বিষয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পুলিশের কাছে প্রতিবাদ করেও কোন ফল হয়নি। শারদীয়ার অনুষ্ঠানের পর পুলিশের এই লজ্জাজনক আচরণ নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন এলাকার হিন্দু সংগঠক শ্রী সুন্দর গোপাল দাস।

প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ

এ কোন বাংলা ?

প্রশাসনের। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে দুষ্কৃতি মুসলিমদের রক্ষার্থে নামল র‍্যাফ, জারী হল ১৪৪ ধারা, পুলিশ ও প্রশাসনকেই করতেহল খন্ডিত দেবীপ্রতিমার বিসর্জনের ব্যাবস্থা। সর্বশেষ পরিস্থিতি হল মুসলীম তোষণের সেই নিরবিচ্ছিন্ন ধারা বজায় রেখেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস করা হল।

প্রশ্ন হল, হিন্দু মন্দিরের সামনে দিয়ে মহরমের তাজিয়া যাবার সময় হিন্দুরা কোন বাধা তো দেয়ই না, বরং তাজিয়ার জন্য ঐ পথে বিনা অনুমতিতে গাছপালা কেটে দেওয়ারও কোন প্রতিবাদ করেনা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নমুনা সেকুলার হবার পরাকাষ্ঠা শুধু হিন্দুরাই দেখাবে? আজকাল হিন্দুর দুর্গাপূজায় মুসলীম অংশগ্রহণ নিয়ে কত সরস প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এ ঘটনায় নীরব সংবা পত্র সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবির দল, এমনকি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও যারা ধোপ দুরস্ত নতুন জামাকাপড় পরে পরিবারের সাথে অষ্টমীতে করজোড়ে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেয়। অঞ্জলি দেওয়া সেই পা যখন ভেঙ্গে দেওয়া হয়, মায়ের মাথা যখন ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয় তখন কি একবারও মনে হয়না এ আমরা কোন বাংলায় বাস করছি ? আমরা কি তবে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ করার জন্য দিন গুনছি?

দুর্গা পূজামন্ডপে গোমাংস

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার দিওড় গ্রামের একটি সার্বজনীন দুর্গাপূজার মন্ডপে ৬ই অক্টোবর ২০০৮ সপ্তমীর দিন গরুর মাংস ও একটি গরুর পা ফেলে দেয় মুসলীমরা। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুলিশ ছুটে আসে যাতে উত্তেজনা না ছড়ায়। কিন্তু পুলিশকে দেখেই বিরোধী গোষ্ঠীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট-পাটকেল ছোড়ে। ইটের আঘাতে আহত হন জেলা শাসক স্বপন চট্টোপাধ্যায় ও জেলা পুলিশ সুপার স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণপাত্র। সেই সঙ্গে দশ পুলিশ কর্মী সহ মোট চল্লিশজন আহত হয়েছেন। কুড়ি রাউন্ড গুলি ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানোর পাশাপাশি লাঠি চার্জও করতে হয়েছে । এই ঘটনায় চারজন মহিলা সহ মোট সাঁইত্রিশ জনকে গেপ্তার করা হয়েছে। ১৪৪ ধারা জারী থেকে বি.এস.এফ ও র‍্যাফ নামাতে বাধ্য হয় পরিস্থিতি শান্ত করতে। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকাতে । বাউল এলাকাতে স্থানীয় বাসিন্দারা দশ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় কেন পূজা মন্ডপে গরুর মাংস ফেলা হবে ? তাহলে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্বটা কাদের, আর হিন্দু-মুসলিম একতা কোন পথে?

জেলা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
ব্লক ভিত্তিক ধর্মীয় জনসংখ্যা ঃ শতকরা হিসাব

ব্লক	ধর্ম	১৯৮১ %	১৯৯১ %	২০০১ %
সোনারপুর	হিন্দু	৮৬.২৩	৮৫.২১	৮০.২৬
	মুসলীম	১২.৬৪	১৩.৬৯	১৭.৬৯
মহেশতলা	হিন্দু	৬৭.৮৪	৬৯.৯১	৬৬.০৯
	মুসলীম	৩১.৬৭	২৯.২৫	২৮.৪৬
ক্যানিং (১-২)	হিন্দু	৬০.৪৬	৫৫.৬৩	৫২.৫০
	মুসলীম	৩৯.২৪	৪৩.৯৬	৪৭.১৬
বাসন্তী	হিন্দু	৬৩.৪২	৫৯.১৬	৫৬.২৩
	মুসলীম	৩৩.০৭	৩৭.৯৫	৪১.১৮
জয়নগর (১-২)	হিন্দু	৫৮.৫৮	৫৫.৭৮	৫৪.০১
	মুসলীম	৪১.৪০	৪৪.০৭	৪৫.৬০
কুলতলি	হিন্দু	৭৭.০২	৮১.০৬	৭৩.২৩
	মুসলীম	২২.৩৮	১৮.১৭	২৬.৬৬
বারুইপুর	হিন্দু	৭১.৮৩	৬৭.৬০	৬৩.৫৪
	মুসলীম	২৭.৫৩	৩১.৫৪	৩৫.৪৩
বিষ্ণুপুর (১-২)	হিন্দু	৭১.২০	৭৯.৭৬	৬৫.০৬
	মুসলীম	২৫.৫৪	১৬.৯৮	৩২.১৬
বজবজ (১-২)	হিন্দু	৭৪.৫৬	৬৭.৫২	৬৫.০১
	মুসলীম	২৫.১০	৩২.৪২	৩৪.৯২
ভাঙড় (১-২)	হিন্দু	৪২.২৪	৩৫.০৫	৩৩.১৩
	মুসলীম	৫৭.৭৬	৬৪.৯৪	৬৬.৭৭
গোসাবা	হিন্দু	৯১.৮৪	৯১.৪৭	৯০.০৩
	মুসলীম	৬.৬২	৭.২৫	৮.৪৮
মগরাহাট (১-২)	হিন্দু	৮৭.৬৩	৫১.২০	৪৭.৫০
	মুসলীম	১০.৮৫	৪৭.৩১	৫১.০৯
মন্দির বাজার (১-২)	হিন্দু	৭৩.২৬	৬৯.৯৪	৬৫.৭৯
	মুসলীম	২৫.৮৫	২৯.৯৮	৩৩.৯১
কুলপি	হিন্দু	৭১.৬২	৬৭.৯৩	৬৩.২২
	মুসলীম	২৭.৯৬	৩১.৬৪	৩৬.৩৫
ফলতা	হিন্দু	৭৫.০৭	৭১.৩৯	৬৮.১২
	মুসলীম	২৪.৮৪	২৮.৫৩	৩১.৮০
ডায়মন্ড হারবার (১-২)	হিন্দু	৬৮.৭৮	৬০.৯৮	৫৭.৮৯
	মুসলীম	৩১.১৫	৩৮.৫৫	৪২.০১
কাকদ্বীপ	হিন্দু	৮৬.০৮	৮৬.৯৩	৮৪.৩০
	মুসলীম	১৩.৮৫	১২.৯৬	১৫.৬০
সাগর	হিন্দু	৯০.৯৩	৯০.১৪	৮৮.৯৬
	মুসলীম	০৯.০২	০৯.৮৬	১০.৯১
মথুরাপুর (১-২)	হিন্দু	৮০.৭২	৭৭.৪২	৭৪.২০
	মুসলীম	১৭.৭২	২১.১৬	২৪.৩১
পাথর প্রতিমা	হিন্দু	৯২.৬৭	৯১.৬২	৯০.৪৩
	মুসলীম	০৭.১৭	০৮.২০	০৯.৩১

[সূত্র ঃ সেন্সাস রিপোর্ট অফ ইন্ডিয়া ঃ ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১]

ফোন নং ঃ— মো ঃ ৯৯৩২৫ ৬৬৪৯৬, বাড়ী ঃ ৯৮০০৪ ৩১৩৩৮

গোপাল গিরিধারী কীর্তন সম্প্রদায়

কীর্তন সুধাকণ্ঠী - **প্রতিমা মণ্ডল**

দল পরিচালক - **অনুপম মণ্ডল**

গ্রাম ও পোষ্ট - পাকুড়তলা, থানা - রায়দিঘী, জেলা - দঃ ২৪ পরগণা

পথনির্দেশ - ডায়মণ্ডহারবার থেকে এম-১০ রায়দিঘীগামী বাসে করিয়া কাশীনগর স্টপেজ অথবা শিয়ালদহ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর ট্রেনে মথুরাপুর স্টেশন হইতে কাশীনগর স্টপেজ থেকে ভ্যানযোগে পাকুড়তলা গ্রাম।

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী চিন্তাবিদ

"শিবপ্রসাদ রায়ের"

অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।
অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশক ঃ তপন কুমার ঘোষ

তুহিনা প্রকাশনী

১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোন ঃ ২৩৬০-৪৩০৬, মো ঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

সব বুক স্টলকে আকর্ষনীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffamil.com